আমি চেয়েছিলাম বাঙালির কাছে ছবি কেনাটা যেন দুঃসাধ্য না হয়ে থাকে

কিংবদন্তী সাহিত্যিক-দম্পতি বুদ্ধদেব বসু, প্রতিভা বসুর ছোটো মেয়ে **দময়ন্তী বসু সিং**। যিনি নিজেও একজন সুলেখিকা ও অধ্যাপিকা। সম্পাদনার কাজেও তিনি দক্ষ। শিল্পপ্রেমী হিসেবে তাঁর পরিচয় সর্বজনবিদিত। একদা তিনি কলকাতাতেই খুলেছিলেন ভিন্নরুচির একটি আর্ট গ্যালারি। তাঁরই সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপচারিতা এবারের উদ্ভাসের ওয়েব ম্যাগাজিনে। শিল্পকলা বিষয়ে এত দীর্ঘ সাক্ষাৎকার তিনি এর আগে কোথাও দেননি। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন শিল্পী কৃষ্ণজিৎ সেনগুপ্ত।

কৃষ্ণজিৎ: বুদ্ধদেব বসু, প্রতিভা বসুর মতো বাবা মায়ের স্নেহস্পর্শে বড়ো হওয়া আপনার। পুরোপুরি সাহিত্যের আবহাওয়া, কিছুটা বোধহয় সংগীতেরও, কিন্তু তারমধ্যেও শিল্পকলা, বিশেষ করে ছবি-ভাস্কর্যের প্রতি আপনার টান কিভাবে শুরু হয়েছিল?

দময়ন্তী: দেখো, যা কিছু আমার শিক্ষা, মূল্যবোধ তা কিন্তু বাবারই দেওয়া। অনেকে একথাটা জানে কিনা আমি জানি না, আমার বাবা কিন্তু খুব তীব্রভাবে শিল্পকলার অনুরাগী ছিলেন। বাবা যখন বই কিংবা পত্রিকা করেছেন তার প্রত্যেকটা মলাটের ডিজাইন সম্পর্কে উনি একটা ধারণা দিতেন। শিল্পীদের সঙ্গে ওনার তো একটা গ্রুপ মতোই ছিল। শেষের দিকে উনি পূর্ণেন্দু পত্রী ছাড়া কাউকে দিয়ে মলাট করাতেন না। তাঁকে লেখা সেই সমস্ত বিষয়ে চিঠিপত্রও সব আছে। তাছাড়াও প্রথম দিকে, বাবা যখন নেহাৎই স্কুলের ছাত্র তখন ‘প্রগতি’ পত্রিকা বের করছেন ঢাকায়, তখন ওঁদের একটা পাওয়ারফুল গ্রুপ ছিল। পরবর্তীতে তাঁরা অনেকেই স্কলার হয়েছেন। বাবাদের সেই ‘প্রগতি’র প্রত্যেকটা মলাট অনিল ভট্টাচার্যের করা।

কৃষ্ণজিৎ: আপনি কি ছোটোবেলা থেকেই এগুলো দেখতেন?

দময়ন্তী: বলতে পারো একেবারে জন্ম থেকে। তার কারণ যে মেয়ে চারবছর বয়সে যামিনী রায়ের কাছ থেকে জন্মদিনে তাঁরই আঁকা ছবি উপহার পায় সে মেয়ের

ভবিষ্যৎটা আন্দাজ করতেই পারো। উনি তখন ভ্যান গঘ সহ অন্যান্য ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীদের ছবি কপি করতেন। সেই কপিগুলো তোমরা সেভাবে হয়তো দেখোনি, আমরা যেভাবে দেখেছি। আমার জন্মদিনে প্রথম পাওয়া উপহারটা ছিল ভ্যান গঘের নীলের ওপর যে সানফ্লাওয়ার্সটা আছে সেটারই কপি। সেটা উনি এঁকেছিলেন একটা পিচবোর্ডের ওপর, একেবারে ডিরেক্ট আঁকা। উনি তো দেশি রঙে ছবি আঁকতেন, সেটা অবশ্য অভিশাপের মতো হয়ে যায়। তার কারণ পরবর্তীতে বেশিরভাগ ছবিই ফেড হয়ে গেছিল। আমার উপহারের ছবিটাও অনেকটা হাল্কা হয়ে গেছে। ছবিটার পিছনে লেখা ছিল 'জন্মদিনে আদরের রুমুকে যামিনীদাদু।' সেই যে লেখাটা সেটা এখন আর প্রায় পড়াই যায় না। এটা যে আমার কাছে কী দুঃখের! এইভাবেই আমার ছবির প্রতি টানের শুরু হয়। আমি বাগবাজারে যামিনী রায়ের বাড়িতে নিয়মিত গেছি। কাজেই একজন মহৎ শিল্পীর সঙ্গে মুখোমুখি হবার সুযোগ আমার ছোটোবেলাতেই হয়েছিল একথা বলতে পারো। আর সেটা হয়েছিল বাবার হাত ধরেই। বাবার সঙ্গে উনি তো ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে গল্প করতেন। এইসব নিয়ে আমি লিখেওছি দেশ পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায়। ওদের দুজনের কিন্তু মত-পার্থক্য ভালোই ছিল। বাবা ছিলেন একটু পাশ্চাত্যধর্মী, সেখানে যামিনী রায় বিদেশি জিনিস মানেই গ্রহণযোগ্য নয় এইরকম একটা মতে বিশ্বাসী। কিন্তু যেখানে ওঁরা মিলতেন সেই জায়গাটাও খুব ইন্টারেস্টিং। দুজনের মধ্যেই যেটা বজ্রকঠিনভাবে ছিল সেটা হচ্ছে স্বধর্ম। নিজের ধর্মপালন কর, That is all you can do. আর সেটা যদি তুমি সৎভাবে করো তাহলে তো তুমি নির্বাণ লাভ করবেই। গীতাতেও এই কথা আছে।

কৃষ্ণজিৎ: যামিনী রায়ের সঙ্গে আপনার কিছু স্মৃতি আমাদেরকে বলুন।

দময়ন্তী: সে তো প্রচুর ঘটনা। যামিনী রায় কিন্তু বাবাকে সবসময় বুদ্ধদেববাবু ও আপনি বলে সম্বোধন করতেন। আর আমার মা ছিলেন বৌমা। আর আমরা ছিলাম নাতি-নাতনি। আমরা যখনই ওনার কাছে যেতাম পুরো স্টুডিওটায় ঘুরতাম। উনি মেঝেতে বসতেন। যামিনী রায়ের স্ত্রী এবং তাঁর বড়োছেলের বউয়ের সঙ্গেও আমাদের খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। আমরা তাঁর বাড়িতে গেলেই উনি মাকে বলতেন 'বৌমা যাও ওপরে যাও, তোমার শাশুড়ি অপেক্ষা করছে।' যামিনী রায়ের স্ত্রী দেখতে ছিলেন অন্নপূর্ণার মতো। মানে এমন একটা মধুর রূপ ছিল তাঁর সেটা চোখে দেখার মতো।

কৃষ্ণজিৎ: আপনারা ছিলেন যামিনী রায়ের একেবারে বাড়ির লোকের মতো।

দময়ন্তী: একদম তাই। আর বাবা ও যামিনী রায়ের সম্পর্কটা তো অনেকদিনের, মানে আমাদের জন্মেরও অনেক আগেকার চেনাশোনা ও বন্ধুত্ব তাঁদের। বাবা যখন কবিতাভবন শুরু করলেন, বাবার তখনকার বেশিরভাগ বইয়েরই মলাট তো যামিনী রায়ের আঁকা – 'দময়ন্তী', 'বিদেশিনী' এরকম অনেক বইয়ের প্রচ্ছদ উনি করেছেন।

তারপর একপয়সার একটি সিরিজেও উনি কাজ করেছেন। আমাদের এত যাতায়াত, এখন ভাবি আমরা কত বোকা ছিলাম। আমরা কখনও ওনার ছবি কিনিনি। এখন তো মানুষ অনেক বুদ্ধিমান হয়েছে, তারা মানুষের কোনো গুণ দেখলেই সেটা রেকর্ড করে রেখে দেয়।

কৃষ্ণজিৎ: যামিনী রায়কে চোখের সামনে বসে ছবি আঁকতে দেখেছেন কখনও?

দময়ন্তী: হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওনাকে আমরা অর্ডার করে ছবি আঁকাতাম তো। কিন্তু আমরা কখনও তাঁর ছবি কিনিনি। উনি তো সবসময়েই ছবি পাঠাতেন। উনি রবীন্দ্রনাথের একটা পোর্ট্রেট মা বাবাকে উপহার দিয়েছিলেন। আমার মা বলতেন রবীন্দ্রনাথের চোখের মধ্যে একটা অ্যাঙ্গার ছিল। মানে তাঁর চোখে শান্তভাব একেবারেই ছিল না, এক ধরণের রাগি চোখ ছিল তাঁর। যামিনী রায়ের করা ওই পোর্ট্রেটটার মধ্যে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চোখের সেই তীব্রতাটা ধরা পড়েছিল। সেই ছবিটা প্রত্যেক বছর পঁচিশে বৈশাখে পাড়ার ক্লাবের ছেলেরা মায়ের কাছে চেয়ে নিত, সেইভাবেই ছবিটা কোনও একবার গিয়ে আর ফেরত আসেনি।

কৃষ্ণজিৎ: ছবিটা এইভাবে হারিয়ে গেল?

দময়ন্তী: হ্যাঁ। আমাদের সংগ্রহে যামিনী রায়ের প্রতিটি ছবি চুরি হয়ে গেছে। এমনকি আমাদের শেষ ছবিটা, মানে যেটা আমাদের ঘরের দেওয়ালে না থাকলে দেওয়ালটাকে অসম্পূর্ণ বলে মনে হত, সেটা একটা মস্ত লম্বা নর্তকীর ছবি – সবুজের ওপরে, সেই ছবিটা মা যখন আমাদের নাকতলার বাড়িটা প্রোমোটারের হাতে দিলেন সেই সময়েই হঠাৎ একদিন মা দেখলেন ছবিটা দেওয়ালে নেই। আমি তো তখন এখানে থাকতাম না।

কৃষ্ণজিৎ: এতো খুবই আক্ষেপের ঘটনা।

দময়ন্তী: ভীষণ ভীষণ আক্ষেপের ঘটনা। দিদির বিয়েতে উনি সেই যে তিনটি বউ নীল শাড়ি পড়া, সেই বিখ্যাত ছবিটা নিজের হাতে উপহার দিয়েছিলেন, দিলীপ কুমার গুপ্তও ছবি দিয়েছিলেন। এই সবই তো বাবার মাধ্যমে, মানে বাবার সম্পর্কের মধ্য দিয়ে আমাদের পাওয়া। বাবার কাছে কে না আসতেন, সত্যিকথা বলতে কি রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বোধহয় আর সকলেই এসেছিলেন আমাদের বাড়িতে। বাবার হাত ধরে কতরকমের কালচারের সঙ্গে যে আমার পরিচয়!

কৃষ্ণজিৎ: আপনি নিজে কখনও আঁকাজোকা করেছেন?

দময়ন্তী: হ্যাঁ। তবে আমার সবচেয়ে ভালোলাগে স্কাল্পচার। হ্যান্ডলিং ক্লে, মানে ক্লে নিয়ে নানারকম খেলা করা। রদাঁর একটা 'কিস্' নামে স্কাল্পচার আছে না!

কৃষ্ণজিৎ: হ্যাঁ, সে তো বিখ্যাত ভাস্কর্য।

দময়ন্তী: সেই মূর্তিটা আমাদের খুব প্রিয় ছিল ছোটোবেলা থেকেই। আমিও তাই দেখে একটা 'কিস্' বানিয়েছিলাম, মাটি দিয়েই। ইট ওয়াজ ভেরি গুড। তখন আমার কত বয়স? এই চোদ্দ-পনেরো হবে আর কি!

আর একজনের কথা আমাকে বলতে হবে তিনি হলেন সৌরেন সেন। ওনার নাম হয়তো তোমরা শোনোনি। কিন্তু উনি ছিলেন এক অর্থে আমাদের বাড়ির অভিভাবক। আমাদের সেই যুদ্ধের সময়টা যে আমরা পেরোতে পেরেছিলাম সেটা উনি ছিলেন বলে। তখন তো কিছু পাওয়া যেতো না। বাবারও রোজগার ছিল খুব কম। সৌরেন সেন তখন ছিলেন নিউ থিয়েটার্স-এর আর্ট ডিরেক্টার। তিনি নিজেও অসাধারণ ছবি আঁকতেন। সৌরেন কাকা যখন স্কেচ করতেন সে এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার! ক্যাজুয়াল স্ট্রোকে যে সব কাজ করতেন, ওঃ কী অসাধারণ! সৌরেনকাকা বোধহয় আমার মধ্যে কিছুটা ট্যালেন্ট দেখেছিলেন।

কৃষ্ণজিৎ: উনি কি আপনাকে উৎসাহ দিতেন ছবি আঁকায়?

দময়ন্তী: হ্যাঁ। সৌরেনকাকা আমাকে জি. সি. লাহার দোকান থেকে রং ড্রয়িং খাতা ইত্যাদি সব কিনে দিতেন।

কৃষ্ণজিৎ: আপনার সেই সময়ের আঁকা কোনও ছবি নেই এখন?

দময়ন্তী: না না সে সব আর কোথায়? সৌরেনকাকার আঁকা ছবিগুলোই আর নেই। একবার উনি ব্যারাকপুরে গান্ধিজি যখন এসেছিলেন তখন আমাদেরকে নিয়ে গিয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধিকে তো দেখেইছিলাম, আর দেখেছিলাম সুরাবর্দিকে। অসম্ভব ফর্সা ছিলেন। একেবারে টকটকে লাল, আমেরিকানদের মতো। সৌরেনকাকা সেখানে তাঁদের সামনে বসে একের পর এক সব স্কেচ করেছিলেন আর তাদের প্রত্যেকটায় বাংলায় ম. ক. গান্ধি সই করা ছিল।

কৃষ্ণজিৎ: সে-সব ছবিও হারিয়ে গেছে?

দময়ন্তী: ভগবান জানে সেগুলো সব কোথায়? আমার মা যে অক্ষম হয়ে গেছিলেন, তার মূল্য আমাদের এইভাবে চোকাতে হয়েছে। কারণ আমার মা-ই তো সারাবাড়িতে কোথায় কি রেখেছেন তার হিসেব রাখতেন। আর এদিকে আমি তো আমেরিকায় চলে গেছিলাম। তারপর তো আমি আর ফিরতেই পারলাম না। যখন ভারতে ফিরলাম, ফিরে তো আর কলকাতায় আসতে পারলাম না। কানপুর, উত্তরবঙ্গে কেটে গেল কতদিন। কানপুরে তো আমি ছিলাম পঁচিশ বছর, উত্তরবঙ্গে পাঁচ বছর। কলকাতায় ফিরি আমি পঁয়ত্রিশ বছর পর। তবে এর মধ্যে বাবার প্রেরণায়, পরামর্শে কতভাবে যে

আর্টের সান্নিধ্য আমি পেয়েছি। এই যে এত বইপত্র তুমি দেখছ – এর মধ্যে আর্টের বইও তো প্রচুর। আজও মনে পড়ে 'ডিকশনারি অফ মডার্ন আর্ট' বইটাকে নিয়ে মজার কথা। আমি বাবাকে বলছি এটায় আমার নাম লিখতে হবে। দিদি বলছে – আমারও নাম লিখতে হবে। এরকম অনেক বই আছে যেগুলোতে বাবা আমাদের দুজনেরই নাম একসঙ্গে লিখে দিয়েছিলেন। আর একটা বইয়ের কথা খুব মনে পড়ছে 'ভয়েসেস্ অফ সাইলেন্স', যেটার মধ্যে অ্যামেজিং সব স্কাল্পচার ছিল। বিরাট মোটা সেই বই। বাবার হাত ধরেই তো এইসব জিনিস দেখতে শেখা। বাবা আমাকে চিঠিতে লিখেছিলেন – ডিগ্রি যদি না আনতে পারো ক্ষতি নেই, কিন্তু যেখানে যেখানে যাবে আর্ট মিউজিয়মগুলো দেখে আসবে। এই যে শিক্ষা – এটা থেকে আজ অবধি আমি বেরোতে পারিনি। আরও পৃথিবীর যে কোনোও প্রান্তেই যাই না কেন প্রথমেই, সেখানে আমি আর্ট-গ্যালারির খোঁজ করি। কলকাতায় তো এরকম কোনও আর্ট গ্যালারি ছিল না এবং এখনও নেই।

কৃষ্ণজিৎ: সেই অভাববোধ থেকেই কি আপনার 'বিকল্প' আর্ট গ্যালারি করার কথা মাথায় এসেছিল?

দময়ন্তী: আসলে কী, আমি দেখছিলাম একজন প্রোফেসর হিসেবে আমার যা উপার্জন তাই দিয়ে আমি মাসের শেষ পর্যন্ত সব খরচাপাতি সামলে কোনো ছবি কিনে উঠতে পারি না। তখনই আমার মনে হয় আমি এমন একটা জায়গা তৈরি করবো যেখানে এসে লোকে স্মল সাইজ পেন্টিং কিনতে পারবে। আর সেটা হবে এই বাংলাতেই। কারণ বাংলাই তো ভারতীয় মডার্ন আর্টের মধ্যবিন্দু। আজও যদি দেখি – অন্যান্য জায়গায় হয়তো একজন দুজন বিশাল নাম করা শিল্পীর দেখা পাবো, সেখানে বাংলায় একটার পর একটা শিল্পী। এতে করে হয়তো আর্ট ব্যাপারটা আমাদের কাছে কিছুটা খেলো হয়ে গেছে।

কৃষ্ণজিৎ: আপনি কলকাতায় পাকাপাকিভাবে কত সালে ফিরেছিলেন?

দময়ন্তী: ১৯৯৬-তে। তারপরের বছরই আমি পাবলিকেশন শুরু করে দিই। 'বিকল্প' নামটি কিন্তু আমি অনেক আগেই ভেবেছিলাম। দি অল্টারনেটিভ।

কৃষ্ণজিৎ: প্রথম বই কি ছিল?

দময়ন্তী: আমার মা প্রতিভা বসুর লেখা 'মহাভারতের মহারণ্যে।' এই বইটা এখনও আমাকে উপার্জন দেয়।

কৃষ্ণজিৎ: এ তো গেল প্রকাশনার কথা, আর বিকল্প গ্যালারির শুরু কবে?

দময়ন্তী: ১৯৯৮ সালে বাবার নব্বই বছরের জন্মদিন হল। সেই সময় পনেরো দিনের একটা উৎসব করেছিলাম। তখনই বাবার জীবনের ওপরে একটা একজিবিশনও করেছিলাম। এটা হয়েছিল গগনেন্দ্র শিল্প প্রদর্শশালায়।

কৃষ্ণজিৎ: এই প্রদর্শনী থেকেই গ্যালারির চিন্তা এল?

দময়ন্তী: সেটা কিছুটা। যদিও তার আগেই আমি অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস থেকে গণেশ বসুর ছবি কিনি। এত ভালো লেগে যায় তাঁর ছবি। আমি যে ছবিটা কিনেছিলাম সেটা ছিল আর্থ কালারে আঁকা, মানে একেবারে প্রাকৃতিক রঙে। সেই আমার ছবি কেনার শুরু। তখনও কিন্তু আমি পাকাপাকিভাবে কলকাতায় আসিনি।

আমার প্রকাশনা চালু হয়ে যাবার বেশ কয়েকবছর পর ২০০২ সালে 'বিকল্প আর্ট শপ' চালু হয়। তার ঠিক একবছর আগেই ২০০১-এ 'স্বভূমি' খোলে কলকাতায়। একটা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল 'স্বভূমি'-তে একজিবিশন। সেই একজিবিশন দেখতে গেলাম আমি সোমনাথ মেহতার সঙ্গে। গিয়ে দেখি সে এক জমজমাট ব্যাপার। ফেরার পথে সিঁড়ির মুখে ছোটো ছোটো কয়েকটা দোকানের মধ্যে 'অরণ্য' নামে স্টলটি আমার নজরে পড়ে। সেই 'অরণ্য'তেই আমার সঙ্গে আলাপ হয় সাহিত্যিক নিমাই ভট্টাচার্যের ছেলে মুকুলের সঙ্গে। সেই আমাকে বলে 'স্বভূমি' কর্তৃপক্ষরা চাইছেন এখানে অন্য ধরণের ভালো কিছু দোকান হোক। আপনিও আসুন না এখানে।

কৃষ্ণজিৎ: মুকুলবাবুই তাহলে আপনাকে প্রাথমিক উৎসাহ দিলেন?

দময়ন্তী: হ্যাঁ, তারপর উনি আমাকে 'স্বভূমি'-র একজন মালিকের সঙ্গে যোগাযোগও করিয়ে দিলেন। আমি প্রথমে দ্বিধায় ছিলাম। কারণ বইয়ের দোকান করলে ওখানে চলবে না সেটা বুঝতে পারছিলাম। ওদিকে ওঁরা তো আমাকে প্রবল উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন। এদিকে আমার জায়াগাটাও বেশ পছন্দ হয়েছে, শেষ পর্যন্ত আমি ওখানে ছবির দোকান করবো বলে স্থির করলাম।

কৃষ্ণজিৎ: আপনি তো নাম রেখেছিলেন 'বিকল্প আর্ট শপ'?

দময়ন্তী: হ্যাঁ, গ্যালারি আর বললাম না। সেই ছবির দোকানে আমরা ছবির পাশাপাশি অনেক ভালো ভালো বিদেশি কাগজ, রং, বই, ছবির প্রিন্ট ইত্যাদিও বিক্রি করতাম।

কৃষ্ণজিৎ: এই দোকানটির মাধ্যমে আপনি তো মধ্যবিত্ত মানুষদেরও ছবি কিনতে শিখিয়েছিলেন?

দময়ন্তী: শুধু মধ্যবিত্ত বলবো না। আমাদের দেশে তো মধ্যবিত্তরাও খুব বেশি রোজগার করতে পারেন না যে চাইলেই তাঁরা একটা ছবি কিনে ফেলবেন। আমার ইচ্ছে ছিল শিল্পীদের আঁকা ছোটো মাপের ছবি বিক্রি করার। 'স্মল ইজ বিউটিফুল' এটাই ছিল আমার 'বিকল্প'-এর আদর্শ।

কৃষ্ণজিৎ: সাড়া কেমন পেয়েছিলেন?

দময়ন্তী: বিশাল সাড়া। প্রথম দিকে তো অভাবনীয়, চারিদিক থেকে কভার করেছিল দিল্লি, বোম্বে।

কৃষ্ণজিৎ: প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের মধ্যে কারা এগিয়ে এসেছিলেন আপনাকে ছবি দেবার জন্য?

দময়ন্তী: প্রত্যেকে। আমরা শুরুই করেছিলাম চল্লিশজন আর্টিস্টকে দিয়ে। তার মধ্যে যোগেন চৌধুরী, প্রকাশ কর্মকার, রবীন মণ্ডল, রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় – কে নেই, সবাই ছিলেন।

কৃষ্ণজিৎ: পরিতোষ সেনও তো কাজ দিয়েছিলেন আপনাকে?

দময়ন্তী: হ্যাঁ। শুধু তাই নয়, তিনি তো জনে জনে বলে বেরিয়েছেন ওইটুকু দোকান ওইটুকু মাপের ছবি বিক্রি করে আমাকে দশহাজার টাকা দিয়েছে! তার মানে ওঁর মতো মানুষের কাছেও ব্যাপারটা ছিল বিস্ময়ের। আসলে তখন তো ওভাবে ছবি বিক্রিই হত না। তারপরে তো অল্পদামে ছবি বিক্রি করার ফ্যাশনটা এল। এই যে এখন 'সিমা' গ্যালারি স্মল প্রাইসে ছবি বিক্রি করে, এটা তো ওরা 'বিকল্প'-কে দেখেই শিখেছে।

কৃষ্ণজিৎ: আপনি তো তরুণ অনামী শিল্পীদের কাজও নিতেন।

দময়ন্তী: হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ছবির সঙ্গে ভাস্কর্যও বিক্রি করতাম। আমার দোকানটা ছিল একেবারে প্রথমে। ওরা তো প্রথমে আমাকে দোতলায় ঘর দিতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি বলেছিলাম দোতলায় ছবির দোকান হতে পারে না। অনেক টানাপোড়েনের পর আমি ঘরটা পাই। আমি আসলে চেয়েছিলাম লোকের নজরে পড়ুক। মানুষতো ছবি দেখুক আগে, তারপরে কেনার কথা। ছোটো ছোটো ছবি দিয়ে সাজিয়েছিলাম ঘরটা। তুমি তো জানোই সব। পঁচিশ হাজার টাকা মাসিক ভাড়ায় শুরু করেছিলাম 'বিকল্প আর্ট শপ।' হাতে তো সময় ছিল না বেশি। তখন কলকাতা বইমেলা চলছে, সেটা শেষ হবার এক মাসেরও আগে চালু করেছিলাম ছবির দোকান।

কৃষ্ণজিৎ: ২০০২-এর মার্চ মাসে প্রতিষ্ঠা বোধহয়?

দময়ন্তী: হ্যাঁ, ২ মার্চ। মাত্র পনেরোটা দিনের মধ্যে আমি 'বিকল্প'-এর জন্য কোথায় না গিয়েছি! শান্তিনিকেতন এবং কলকাতায় যে যেখানে শিল্পী ছিলেন প্রত্যেকেই আমাকে ছবি দিয়েছিলেন। ছোটো ছবি বলে প্রত্যেকে অন্তত দু-তিনটে কী তারও বেশি করে ছবি দিয়েছিলেন। শুরুই করেছিলাম ৫০/৬০টারও বেশি ছবি দিয়ে। তখন আমি বুঝেছিলাম সহযোগিতা করা কাকে বলে! পঁয়ত্রিশ বছর আমি দেশে ছিলাম না কিন্তু আমার পরিবার তো ছিল। সেই পরিচিতিটাই হল আসল। প্রথমে আমি এক লাখ টাকা হাতে নিয়ে শুরু করেছিলাম। ওদেরকে তিনমাসের ভাড়া হিসেবে পঁচাত্তর হাজার টাকা আগাম দিয়ে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম যাক্ অন্তত তিনমাস তো আমাকে কেউ ওঠাতে পারবে না।

কৃষ্ণজিৎ: মানে শুরুতে আপনি এটাকে লং টার্ম ভেঞ্চার বলে ভাবেননি?

দময়ন্তী: একেবারেই না। কি করে ভাববো?

কৃষ্ণজিৎ: পরবর্তী তিনমাসের মধ্যেই আপনি সেই আত্মবিশ্বাসটা পেয়ে গেলেন।

দময়ন্তী: দ্যাখো আমি শুধু আবেগ দিয়ে চলতে শুরু করেছিলাম। জীবনে আমি যা যা করেছি সবই প্রায় আবেগের জোরে। এখন আবেগটা নিশ্চয়ই অন্যদের মধ্যে রিফ্লেক্টেড হয়েছে। তা না হলে আমি এভাবে কেন সবকিছু পাবো তাদের কাছ থেকে? তুমি ভাবলে অবাক হয়ে যাবে, শিল্পীরা আমার কাছ থেকে কোনওরকম ডিম্যান্ড পর্যন্ত করেননি। তুমি যেমন দামে পারবে তেমনিই বিক্রি করো না। আমি নিজের কাছে যেহেতু প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে সাধারণ লোককে ছবি কেনাতে চাই তাই ছবির দাম স্থির করেছিলাম তিন হাজার টাকা থেকে কুড়ি হাজার টাকার মধ্যে। এর বেশি আমি দাম রাখিনি।

কৃষ্ণজিৎ: এটাতো একটা বিপ্লব ছবি কেনাবেচার দুনিয়ায়।

দময়ন্তী: বিপ্লবই তো। আমি বড়োলোক নই বলে, কোনও নামকরা হাউসের কেউকেটা নই বলে আমার কৃতিত্বটা কোনো ইতিহাস বইয়ে লেখা থাকলো না। এই যে ছোটো ছবি কম দামে দেওয়া এটা এর আগে কোনওদিনও হয়নি। এমনও হয়েছে জানো, তিনহাজার টাকা দামের ছবি কিনেছে একটি মেয়ে। সে একহাজার টাকা করে তিনমাসে আমাকে ছবির দাম দিয়েছে। এই জায়গাটা আমি সত্যিই তৈরি করতে পেরেছিলাম। এরপরে কি হল জানো, চারিদিকে এইরকম ছোটো ছবি বিক্রির একটা ধুম পড়ে গেল।

কৃষ্ণজিৎ: 'বিকল্প'র জেরেই এটা হল?

দময়ন্তী: অ্যাবসোলিউটলি। এমনও হয়েছে বড়ো বড়ো গ্যালারি মালিকরা দুপুরবেলায় দোকানে এসে আমি যখন থাকি না, তখন এসে ছবি কিনে নিয়ে গেছে। ব্যবসা করবে বলে। আমাকে শিল্পী সুহাস রায় বলেছিলেন, তাঁকে নাকি অন্যান্য গ্যালারি-ওনাররা বলেছিলেন দময়ন্তীকে কেন আপনারা ছবি দিচ্ছেন? সে তো আপনাদের ছবির দাম কমিয়ে দিচ্ছে! তারা তো বোঝেনি আমার মিশন ছিল একদম অন্য। গ্যালারিওলারা ছবির দাম বাড়িয়ে দেবার পক্ষে। একই ছবি আমি যে দামে বিক্রি করেছি সিমা সেই ছবি তার থেকে অন্তত ওয়ান থার্ড বেশি দামে বিক্রি করে। আমি নাম করেই বললাম। একবার মানেকা গান্ধি এসেছিলেন 'বিকল্প'তে, মানিদা মানে কে. জি. সুব্রমনিয়মের সমস্ত কাজ দেখে উনি নিতে চাইলেন। আমি তখন ছিলাম না দোকানে। আমার ছেলেটি ছিল। সে ছবি ওঁকে দিয়ে দেয়। পরে তো সর্বনাশ হল। মানিদার কাছে শুনি মানেকা গান্ধি 'বিকল্প' থেকে ছবি কেনার পর সরাসরি শান্তিনিকেতনে চলে গিয়ে

মানিদার স্টুডিও থেকে সব ছবি 'বিকল্প'র দামে কিনে নেন একরকম জোর করে। বোঝো ব্যাপার!

কৃষ্ণজিৎ: খুব আশ্চর্য তো!

দময়ন্তী: পরে মানেকা গান্ধি দিল্লিতে গিয়ে ওইসব ছবি বিক্রি করেন বেশি দামে। আসলে ওঁদের থেকে আমার লক্ষ্য তো ছিল আলাদা। আমি কখনও বেশি উপার্জন করতে চাইনি। আমি চেয়েছিলাম লোকে ছবি দেখুক। অন্তত বাঙালির কাছে ছবি কেনাটা যেন দুঃসাধ্য না হয়ে থাকে।

কৃষ্ণজিৎ: আসলে আপনি চেয়েছিলেন একটা স্বচ্ছ লেনদেন। শিল্পীদের কাজ লোকে ভালোবেসে কিনে নিয়ে যাক একটা ভদ্রসভ্য দামে।

দময়ন্তী: একদম তাই। শিল্পীরাও তো কত এসেছেন আমাদের বিকল্পতে। তাঁরা বলেছেন কত গ্যালারিতে তো গিয়েছি, এখানে এলে যেন মনে হয় নিজের বাড়িতে এসেছি। তার কারণ সেখানে পরিষ্কার চোখের সামনে সব কাজকর্ম হত। কোনো গোপনীয়তা বা কারচুপি ছিল না।

কৃষ্ণজিৎ: আচ্ছা একটা কথা খুব জানতে ইচ্ছে করছে, বিকল্প আর্ট শপ এত সুন্দর চলছিল, এত মানুষের ভালোবাসা ছিল, তবু কেন সেটা বন্ধ হয়ে গেল?

দময়ন্তী: সে একটা খুব দুঃখের ব্যাপার। দ্যাখো কয়েকবছরের জন্য ছবির বাজার এমন একটা জায়গায় উঠেছিল যে আমিও তিন হাজার টাকা দামের ছবি সত্তর হাজার টাকায় বিক্রি করেছি। পরে আর সেটা রইলো না। আমি তো ছোটো ছবির একজিবিশন করেছিলাম, যেখানে ওইটুকু ছবিও এক লক্ষ টাকার কমে বিক্রি হয়নি। মানে বাজারটা এতদূর অবধি পৌঁছেছিল। এটা যেন ঠিক শেয়ার মার্কেটের মতো এবং শেয়ার মার্কেটের সঙ্গেই জড়িত। এই যে দুহাজার সাতের পরে আট, চিন্তা করে দেখো ঠিক এই সময়টায় পুরো একটা ইকোনমিক ক্র্যাশ হল। আমাদের যাঁরা ক্রেতা ছিলেন তাঁরা কেউ সিঙ্গাপুরে থাকেন, কেউ আমেরিকায়, ইংল্যাণ্ডে থাকেন আর ভারতে দিল্লি, বোম্বে কিংবা ব্যাঙ্গালোরে। কলকাতায় আমরা তেমন কোনও বেস করতে পারিনি। এই ক্রেতারা ছবি কিনতেন তাঁদের হাতে এক্সট্রা টাকা ছিল বলেই না। তাঁরা তখন আসলে ছবিতে টাকা ইনভেস্ট করছিলেন। এর ফলে শিল্পীদের কত কাজ যে বিক্রি হয়েছে। এই যে শুভা মানে শুভাপ্রসন্ন, সে যে কী পরিমাণ ছবি বিক্রি করেছে সেই সময়। তারপর শিপ্রা, মানে শুভার স্ত্রী, তার আগে ওর ছবি কিই বা বিক্রি হত? ওই সময়েই তো ওকে সবাই জানল। আর সেও অনেক পরিণত হল। সেই যে ধস, এতে আমাদের ক্লায়েন্ট বেসটা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেল। আজ অবধি সেটা আর ওঠেনি। আর যেহেতু এটা আমার নিজের জায়গা ছিল না, ওই ভাড়া দিয়ে গ্যালারি চালানোটা আমার পক্ষে তখন অসম্ভব হয়ে পড়ল।

কৃষ্ণজিৎ: আর 'স্বভূমি'ও তো তখন আস্তে আস্তে নিষ্প্রভ হয়ে পড়ছিল ক্রমশ।

দময়ন্তী: একদম। কেউ আসে না তখন ওখানে, মাসে পাঁচ হাজার টাকার বিক্রি নেই। একে একে দোকানঘরগুলোও বন্ধ হয়ে যেতে লাগল। দোতলাটা তো একেবারে ফ্লপ খেয়ে গেল।

কৃষ্ণজিৎ: 'বিকল্প' ঠিক বন্ধ হল কবে?

দময়ন্তী: দু হাজার দশ সাল হবে। যদিও আমি তার আগেই ছেড়ে দিয়েছিলাম। তার কারণ ইতিমধ্যেই সব দোকানগুলো বন্ধ হতে শুরু করে দিয়েছিল, আমরা ওখানে একা ভূতের মতো বসে থাকতাম। চোখের সামনে জায়গাটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেল। সত্যিই যেন একটা ভৌতিক জায়গা হয়ে গেছিল 'স্বভূমি'।

কৃষ্ণজিৎ: 'বিকল্প'তো আর নেই। আপনি কি এখনও আবার এই রকম কিছু করার স্বপ্ন দেখেন?

দময়ন্তী: দেখি তো, বিশাল স্বপ্ন আমার। তবে আমি এখনও যদি কিছু করি তবে সাধারণ মানুষের জন্যই করবো। আসলে কি জানো আমি তো পাশে কাউকে পাচ্ছি না। তোমাদের মতো কাউকে পেলে আমি অনেককিছুই হয়তো করে ফেলতে পারতাম।

কৃষ্ণজিৎ: আচ্ছা এবারে আমরা একটু অন্য প্রসঙ্গে যাই। আপনি তো বিদেশেও অনেক জায়গায় গিয়েছেন, থেকেছেন। আমাদের দেশের সঙ্গে ওদেশের ছবির দর্শকদের মূল পার্থক্যের জায়গাটা ঠিক কি – যদি একটু বলেন।

দময়ন্তী: প্রথম যখন আমি আমেরিকায় যাই, তার আগে আমি লণ্ডনে দুসপ্তাহ মতো ছিলাম। ইতিমধ্যেই বাবা তো আমাকে জপিয়ে দিয়েছিলেন যেখানেই যাও না কেন প্রথমে আর্ট গ্যালারি আর মিউজিয়মগুলোতে যাবে। লণ্ডনেই আমি প্রথম সত্যিকারের আর্ট গ্যালারি বলতে যেটা বোঝায় তা দেখি।

কৃষ্ণজিৎ: আপনি কত সালে গিয়েছিলেন ওদেশে?

দময়ন্তী: ১৯৬২-তে। সেখানে প্রথম আমি ওরিজিন্যাল রেমব্রান্ট দেখি। জানি না আমার বাবা যেমন রেমব্রান্ট বলতে অজ্ঞান ছিলেন, আমিও তাঁর প্রভাবেই রেমব্রান্ট-পাগল কিনা। রেমব্রান্ট আমার শিরায় উপশিরায়। আর হচ্ছে ইম্প্রেশনিস্ট-শিল্পীরা। তাঁদের কোনও তুলনা নেই। আমি যখন পরে আমার ছেলের কাছে যাই তখন প্রথমেই ওদের বলে দিয়েছিলাম আমি কিন্তু হল্যাণ্ডে যাবো।

কৃষ্ণজিৎ: মানে, রেমব্রান্ট আর ভ্যান গঘের দেশ!

দময়ন্তী: হ্যাঁ। সেখানে আমার একটা মস্ত আকর্ষণ ছিল রেমব্রান্টের বাড়ি, যেখানে উনি ছিলেন। সেটার কথা কিন্তু খুব বেশি লোকে জানে না। সবাই মিউজিয়মটাই দেখতে যায়।

কৃষ্ণজিৎ: সে বাড়ি তো বোধহয় একসময় নিলাম হয়ে গেছিল?

দময়ন্তী: হ্যাঁ, সে তো হয়েইছিল। কিন্তু আমাদের সঙ্গে ওদেশের যেটা তফাৎ, সেটা বলি। রেমব্রান্ট এত টাকা রোজগার করেছিলেন আর প্রতিটি টাকা খুইয়েছিলেন। উনি দেউলিয়া হবার পর নিলামে যিনি শিল্পীর বাড়িটা নিলেন, সেই বাড়িটি থেকে পাওয়া ভাঙা বাসনের টুকরো অবধি তিনি সংরক্ষিত করে রেখেছেন। তিনি প্রতিটি জিনিসের হিসেব রেখেছেন। আমার বাবা যদি আমাকে বলে না দিতেন তাহলে কিন্তু আমার রেমব্রান্ট্রের বাড়ি দেখা হত না। উনি বলেছিলেন 'রেমব্রান্টের বাড়ি অবশ্যই দেখবি, মিউজিয়ম না দেখলেও চলবে। কারণ তাঁর কাজ পৃথিবীর সমস্ত মিউজিয়মে তুই দেখতে পাবি।' আমি ওখানে যাঁদের বাড়িতে ছিলাম তাঁরা ওখানে চল্লিশ বছর ধরে আছেন, বাঙালি দম্পতি। তাঁরা কিন্তু রেমব্রান্টের বাড়ির কথা জানতেনই না।

কৃষ্ণজিৎ: রেমব্রান্টের বাড়িতে কি সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল?

দময়ন্তী: হ্যাঁ একদম। It's a musium।

কৃষ্ণজিৎ: আমরা আবার মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি। আপনি এদেশ-ওদেশের শিল্পপ্রেমী দর্শকদের মূল পার্থক্যের জায়গাটা যদি বলেন।

দময়ন্তী: অবশ্যই। আসলে আমি সারা পৃথিবীর এত মিউজিয়ম ঘুরেছি যে আলাদা করে তার একটা হিসেব রাখাই মুশকিল। মূল ব্যাপারটা কি জানো, সেটা হল শিক্ষা। তুমি যদি দ্যাখো আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকের সংখ্যা কত, আর ইউরোপে বা

আমেরিকায় বা যেকোনো পাশ্চাত্যের দেশে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যাটা কত? শিক্ষিত বলতে আমি এখানে শুধু ডিগ্রিধারী লোকের কথা বলছি না কিন্তু। আমি বলতে চাইছি কালচারড সোসাইটির কথা। কালচারড সোসাইটিটা আমাদের দেশে নেই, যে সোসাইটি রাস্তা পরিষ্কার রাখে, তারাই কিন্তু ছবি দেখতে যায়। এই সোসাইটিটা জোরে কথা বলে না। পাবলিক প্লেসে নিজের ব্যক্তিগত কথা হাম্ হাম্ করে বলতে বলতে চলে যায় না। সেই সোসাইটিটাই কিন্তু ভালো ছবি দেখতে জানে বা ভালো বইয়ের কদর করে। এই পুরো জিনিসটাই আসে শিক্ষা থেকে। আমরা বড়ো ইনডিসিপ্লিন জাত। আমাদের ক্ষেত্রে স্বাধীনতাটা যেন একটা লাইসেন্স। স্বাধীনতার মূল্য আমরা দিতে জানি না, তাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে শিখি না। আমাদের কাছে স্বাধীনতার মানে রাত্রি আড়াইটের সময় কানের কাছে বিশাল শব্দ করে বাজি ফাটানোর অধিকার। আমার সুইৎজারল্যান্ডের অভিজ্ঞতার কথা তোমায় বলছি। সেখানে তুমি যদি একটা আবাসনে থাকো, সেখানে তুমি কাজের দিনে কোনো পার্টি করতে পারবে না। যদি উইক এন্ডে তুমি কোনও পার্টি করো তাহলে রাত দশটার মধ্যে তোমাকে সেটা শেষ করতে হবে।

কৃষ্ণজিৎ: মানে আপনি বলতে চাইছেন ব্যবহারিক জীবনে এইসব সুঅভ্যাসের অভাবটাও আমাদের দেশে শিল্পচর্চার পক্ষে অন্তরায় হয়েছে।

দময়ন্তী: একদম তাই। আমরা সবাই বাঙালির সংস্কৃতি নিয়ে কথা বলি। কিন্তু আজ সেটা কোথায়? আমার তো এখন মনে হয় রবীন্দ্রনাথ নয়, আমাদের আগে বিবেকানন্দে ফিরে যেতে হবে। যিনি কর্মযোগের বিদ্যা আমাদের দিয়েছিলেন। সেই গীতা-বেদ-উপনিষদের থেকেই আমাদের সব শুরু করতে হবে। তা না হলে আমাদের কোনোও ভবিষ্যৎ নেই। রবীন্দ্রনাথের গান দিয়ে আজ আর কিচ্ছু হবে না। রবীন্দ্রনাথের দুটো গান গাইতে পারলেই যেন সব হয়ে গেল। এটা আজ আমাদের একটা মুখোশ হয়ে গেছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে রবীন্দ্রনাথের গান বাজালেই কি কালচার্ড হওয়া যায়? Unfortunately Rabindra Sangeet is very easy to sing। কাজেই সেটা খুব পপুলার। আর খুব পপুলার হয়ে যাওয়ার কিছু কুফল তো থাকেই।

কৃষ্ণজিৎ: আমাদের সমাজে আগে কি এর থেকে ভালো কিছু ছিল বলে আপনার মনে হয়?

দময়ন্তী: না, পরিচ্ছন্নতার বোধটা কিন্তু আমাদের আগে ছিল। কিন্তু এখন যেন কেমন একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি হয়েছে। আরবান সিচুয়েশনে পরিচ্ছন্নতাটা অনেক কমে এসেছে। তার কারণ এত রাশি রাশি লোক। এখানকার বেশিরভাগ লোকই স্বাধীনতা আর স্বেচ্ছাচারিতার পার্থক্যটাই বোঝে না। আজকে নরেন্দ্র মোদী একটা ঝাঁটা নিয়ে বেরোলেই তো আর সমস্যার সমাধান হবে না। এই সমস্যার শেকড় অনেক গভীরে। আর পুলিশের ভূমিকা? এটাও কিন্তু একটা কালচারেরই দিক। বিদেশে পুলিশ কিন্তু

সত্যিই নাগরিকদের রক্ষাকর্তা। ওখানে একজন বাচ্চাও জানে আমি বিপদে পড়লে আগে পুলিশকে বলবো।

কৃষ্ণজিৎ: আর এখানে বাচ্চারা তো পুলিশকে ভয় পায়।

দময়ন্তী: তা হলেই বোঝো! পুলিশের জায়গাটা এখানে এতটাই খারাপ হয়ে গেছে। তবু তারই মধ্যে আমাদের যেটুকু করণীয় সেটুকু করতেই হবে। আমি দেখেছি টাকায় সুখ আসে না। সভ্যতা বলো, ভদ্রতা বলো কোনোটাই কিন্তু টাকার মাধ্যমে আসে না। এই চেতনাগুলো যদি নতুন প্রজন্মের মধ্যে আবার আমরা প্রোথিত করতে পারি তাহলে হয়তো কিছু করতে পারবো। যেমন আমরা আগে জানতাম গরিব মাস্টারমশাই হচ্ছেন সবচেয়ে সৎ, সবচেয়ে সম্মানিত ব্যাক্তি। আমাকে ইউনিভার্সিটির ছেলেমেয়েরা বলেছে – দিদি আমরা ভালো করে কোনো শিক্ষকের দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারি না।

কৃষ্ণজিৎ: শ্রদ্ধেয়কে আমরা আর যেন খুঁজে পাচ্ছি না।

দময়ন্তী: একজন দুজনকে যদি পাওয়া যায় তাহলে তাদেরকেই প্যাম্পার করতে হচ্ছে। অথচ উনিশ শতক যদি দেখি, এমনকি বিশ শতকের প্রথম দিকও যদি দেখি, কত গুনীর দেখা পাবো।

কৃষ্ণজিৎ: তাঁদেরকে নিয়েই এখনও আমাদের চলতে হচ্ছে।

দময়ন্তী: তাই তো।

কৃষ্ণজিৎ: এবারে একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে যাই। আপনার কি মনে হয় – চিত্রকলাকে লোকে কিভাবে ভালোবাসবে? আমাদের দেশে চিত্রচর্চার পথে বাধাটা ঠিক কোথায়? এই বিষয়ে ঠিক কিভাবে কাজ করা উচিত?

দময়ন্তী: তোমরা যেটা চাইছো, ছবি বিষয়ে লোকের আড়ষ্টতা ভাঙানো। আগে যেটা আধুনিক কবিতা সম্পর্কে অনেকটা ছিল। এখন ছবি সম্পর্কে লোকে বলে ওরে বাবা, আমরা বুঝি না। কেন যে বলে? ছবি তো আসলে একটা বড়ো জিনিস। এটার কাছে আসতে গেলে একটা চর্চা লাগে, ভালোবাসা লাগে। যতই তুমি বই বা ওয়েবসাইটে ছবি দেখো সত্যিকারের ছবির কাছে গিয়ে ছবি দেখা তো একটা অন্য জিনিস। সে অভিজ্ঞতা টোট্যালি ডিফারেন্ট। আমাদের দেশে কটা মিউজিয়ম আছে যে লোকে গিয়ে ওরিজিন্যাল ছবি দেখবে? আমাদের এখানে মিউজিয়মের বাংলা অর্থ হল 'যাদুঘর'। এটা তো কোনো একটা মানে হল না। ছবি দেখার মিউজিয়ম এখানে কোথায়? এই শুভাপ্রসন্ন একটা করলো, আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। আই ওয়জ ভেরি প্রাউড।

কৃষ্ণজিৎ: আপনি আর্টস একরের কথা বলছেন?

দময়ন্তী: হ্যাঁ। এখন এটা নিয়েও অনেক কথা, প্রশ্ন, বিতর্ক। আমি খুব দুঃখ পাবো যদি এটা বন্ধ হয়ে যায়। যেভাবেই হোক একটা ভালো জিনিস যদি থাকে তাতে তো ক্ষতি নেই কোনো। কতদিন ধরে তো শুনছি সিমা এরকম একটা স্থায়ী আর্ট গ্যালারি

করবে। কিন্তু হচ্ছে কই? আর একটা কথা বলছি, ইউরোপে আমার ছেলে যেখানে থাকে – বাজেল তার নাম। ছোটো একটা শহর। সেখানেও পঞ্চাশটার ওপর মিউজিয়ম আছে, ভাবতে পারো! ছবিরই শুধু নয়, মিউজিয়ম অফ এভরিথিং। প্রত্যেকটা জিনিসই যে সংরক্ষণযোগ্য সেই বোধটা ওদের মধ্যে কত সুন্দরভাবে আছে – তাই শুধু ভাবি। আসলে ইতিহাসবোধ, সচেতনতা এই জিনিসগুলোই আমাদের মধ্যে নেই। আমরা সংরক্ষণ করতে জানি না। আমি যে অত ছোটো জায়গায় একটা ছবি দেখার ব্যবস্থা করতে পেরেছিলাম, সে তো এই ভাবনার বিপরীতে হেঁটেই। 'বিকল্প' তো কোনও মিউজিয়ম ছিল না। তবু তারই মধ্যে কতলোক এসে ছবি দেখে গেছে। পাল্টে পাল্টে ক্রমাগত প্রদর্শনী করেছি। আমার গ্যালারিতে যত লোকের পা পড়েছে আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি এই শহরে আর কোনো গ্যালারিতে তত লোকের পা পড়েনি। কাজেই আমরা ছোটো করেও তো মিউজিয়ম করার কথা ভাবতে পারি। তুমি যেমন ছোটো করে হলেও ভাবছো মানুষকে ছবি ভাস্কর্য বিষয়ে ইন্টারেস্টেড করে তোলার কথা, আমিও সেভাবেই ভেবেছিলাম।

কৃষ্ণজিৎ: আসলে আমরা যেখানে থাকি সেখানটা দিয়েই তো শুরু করতে পারি।

দময়ন্তী: এগজ্যাক্টলি। সেখান থেকেই তো শিল্পচর্চার শুরু হওয়া উচিত। এই যে সকলে বলে 'আমি তো ছবি বুঝি না'। আমি সকলকে বলি ছবিতে তো বোঝার কিছু নেই বাবা। ছবি থেকে দুটো জিনিস হতে পারে। একটা হল ভিস্যুয়ালি আনন্দ পাওয়া, আর দ্বিতীয় যেটা হল সেটা দেখবে কোনো কোনো ছবি মানুষের মনের একেবারে ভেতরে গিয়ে নাড়া দেয়। যে দেখছে সে হয়তো নিজেও জানে না কেন সেটা তাকে এত নাড়া দিচ্ছে।

কৃষ্ণজিৎ: সেটা একটা অলৌকিক উপলব্ধির মতো।

দময়ন্তী: অনেকটা। তুমি বলই না বাবা যে – এই ছবিটা তোমার ভালো লেগেছে। এইটুকুই তো। ছবিকে একটা সহজ দ্রষ্টব্য জিনিস করে দেখা, আর তো কিছু নয়। এই দেখাটুকু যাতে হয় তার জন্য আমরা একসময় দেশ বিদেশের কত শিল্পীর ছবির প্রিন্ট বিক্রি করেছি। আমার তো মনে হয় এই যে টিভি সিরিয়ালে এখন যেসব ছবির প্রিন্ট দেখা যায় সেগুলো সব আমার কাছ থেকেই কেনা। আমি এগুলো দিল্লি থেকে নিয়ে আসতাম। আমি তো এখনও চাই এমনি করেই ছবির প্রচার করতে। কিন্তু আমার বয়সটা তো কম হল না, এখন পঁচাত্তর। সুতরাং ভেবে দেখো। তোমাদের মতো কেউ যদি গ্যালারি করে তাহলে আমি হয়তো যখন বিদেশ যাবো তখন তাদের জন্য ছবির ভালো প্রিন্টস্ এনে দিতে পারি। তারা এগুলো নিয়ে প্রদর্শনী করবে, আমি তাদের সঙ্গে থাকবো। আমি মনে করি এগুলোর খুব প্রয়োজন আছে। এই যে তোমরা

ছবি নিয়ে এইসব কাজ করছো আমি এগুলোকে দারুণভাবে সমর্থন করি। আমি তো তোমাদের সঙ্গেই আছি।

কৃষ্ণজিৎ: আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দিদি। আপনি ভালো থাকুন, আনন্দে থাকুন।

দময়ন্তী: তোমরাও ভালো থেকো।

সাক্ষাৎকারটি নেওয়া হয় ২০১৪সালের অক্টোবরে কলকাতায় দময়ন্তী বসু সিং-এর নিজস্ব বাসভবনে।

চিত্র পরিচিতি : ১। নিজ বাসভবনে দময়ন্তী বসু সিং; ২। দময়ন্তী বসু সিং-এর নিজের তৈরী মাটির কাজ; ৩। রামকুমার মান্নার ভাস্কর্য : নিজস্ব সংগ্রহ; ৪। রেমব্রান্টের বাড়ি; ৫। রেমব্রান্টের বাড়ির অন্দরমহল।